কুসুমপুরের যৌবন

শক্তিপদ রাজগুরু

গ্রন্থতীর্থ
GRANTHA TIRTHA CALCUTTA
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

নীল আকাশের গায়ে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়িয়ে পড়েছে, সাদা মেঘের টুকরোর বুকে ওই কালো ফেঁসে যাওয়া ধোঁয়ার হিজিবিজি আঁচড়গুলো হাওয়ায় ভেসে ভেসে চলেছে দূরের দিগন্ত সীমার দিকে।

কাছিমের পিঠের মত উঠে গেছে এই দিগন্ত, রুক্ষ কর্কশ মাটি। কোথাও পলাশ, আঁটাড়ি লতার সবুজ বনসীমা, দূরে দুএকটা বসতির চিহ্ন দেখা যায়, ওগুলো অন্য কোন কোলিয়ারীর কুলি বসত। আকাশে এখানে ওখানে ঠেলে উঠছে কোন কোলিয়ারীর পিট হেড-গিয়ারের গোল বড় বড় চাকাগুলো, মাটির অতলে নেমে যাবার চান্‌কের উপর।

লাল সড়কটা পলাশ ছড়ানো-ছিটোনো দু চারটে খেজুর গাছের পাহারা এড়িয়ে মাটির বুকে কোলিয়ারীগুলোর জল-নিকাশী ছোট্ট জোড় পার হয়ে চলে গেছে দূরের কোলিয়ারীগুলোর দিকে। দুচারটে ট্রাক কয়লা বোঝাই করে ফিরছে।

লাল মাটির পথের লালচে রং এখানে কয়লার ধুলোয় কালো, বিবর্ণ।

সুবিনয় সাবধানে গাড়িটা চালিয়ে যাচ্ছে, খানাখন্দ বাঁচিয়ে যাবার চেষ্টা করে, কিন্তু উপায় নেই। কয়লা বোঝাই ট্রাকগুলো যাতায়াতের পথটাকে খাল করে দিয়েছে।

সুবিনয় ভাবছে রাস্তাটাকে এইবার মেরামত করাতে হবে। এটা তাদের কোলিয়ারীর প্রাইভেট রোড। সামনে কুসুমপুর কোলিয়ারী।

চারিদিকে রুক্ষ প্রান্তর। বনতুলসী, ছোট ঝুপি পলাশ গাছের জঙ্গল। ওপাশ দিয়ে কোলিয়ারীর জল-নিকাশী একটা জোড়, ছোট্ট নদীর রূপ নিয়ে পলাশ বনের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে।

সুবিনয় রাস্তাটা পার হয়ে এদিকের গ্রামের কাছে এসে পড়েছে।

—সেলাম সাব্!

—সেলাম!

কুসুমপুরের কিছু মানুষ এদিকের মাঠে কাজ করছিল। সুদাম ঘোষের ছেলেটাও বাবার দেখাদেখি নমস্কার জানায় সুবিনয়কে।

সুবিনয় চাইল ওদের দিকে।

মাঠ এখানে তেমন উর্বর নয়, কঠিন মাটি, ধাপে ধাপে নেমে গেছে, উপরের দিকে জমিকে এরা বলে ডিহি, তার পরের নীচের দিকের জমিকে বলে বাইদ, তার নীচের জমি সোল, সেখানের মাটিতে তবু কিছুটা রস থাকে বৃষ্টি হলে। তারও নীচের স্তরের জমিগুলোয় কিছুটা জল থাকে, অপেক্ষাকৃত উর্বর। তাই চাষ ভালোই হয়। সেই ধরনের জমিকে এরা বলে সোল জমি। তার পরিমাণ সামান্যই।

উপরের স্তরে এই জমি, গ্রাম বসত—বাগান কিছু আছে। কিন্তু এ মাটির অতলে রয়েছে কয়লার স্তর। সেই স্তর আবার একাধিক।

প্রকৃতির নিয়মে এ মাটির নীচে কোথায় শ দুয়েক ফিট নীচে রয়েছে কয়লার একটা স্তর, আবার পাথর মাটি জল প্রভৃতির স্তরের নীচে রয়েছে আরও একটা কয়লার স্তর।

তারও শ তিনেক ফিট নীচে বয়ে গেছে কয়লার তৃতীয় স্তর। অফুরান এ সম্পদ।

সুবিনয়ের পিতামহ প্রায় সত্তর বছর আগে এই বিস্তীর্ণ এলাকা কিনেছিলেন এক সাহেবের কাছে। মিঃ কুক সেদিন ভাগ্য সম্বল করেই কোলিয়ারীর ব্যবসায় নেমেছিলেন।

রানীগঞ্জ এলাকার আশপাশে তখনও ঘন বন, জি. টি. রোডটাই ছিল দুদিকে ঘন বনে ঢাকা। দুর্গাপুর থেকেই শুরু হয়েছে ঘন শাল বন। দিনমানেও মানুষ জন সাবধানে কোন রকমে পথটা পার হয়ে যায় ঠ্যাঙ্গাড়ের ভয়ে।

যাত্রীরা যায় দল বেঁধে, দু'একটা উটের গাড়ি সওয়ার নিয়ে যায় ওই রাস্তা ধরে।

সাহেব কোম্পানীগুলো সেইদিন থেকেই এই এলাকায় কোলিয়ারীর পত্তন করে কয়লা তুলতে থাকে। তখন কঠিন সংগ্রামের ব্যবসা।

এই এলাকার শিয়ারশোল রাজ এস্টেট, বর্ধমান রাজ এস্টেটের দিগন্তবিস্তৃত খাস পতিত বনে ঢাকা জমি। তাতে ফসলও হয় না। ফলাবার মত লোকও নেই।

আর কিছু জমিদার যারা রয়েছেন তারা ওই সব ব্যবসার ধকলে যেতে নারাজ। চিনকুঠিতে কয়লাকাটানোর মত নোংরা কাজ করার কথা তারা ভাবতেই পারেন না। তাদের জমিদারীর বাঁধা আয় মন্দ নয়, আর হ্যাপা এড়াবার জন্যই অনেক সাহেব কোম্পানীকে তারা ওইসব পতিত বনঢাকা প্রান্তর নামমাত্র খাজনায় ইজারা দিয়ে দ্যান কিছু থোক টাকা সেলামী নিয়ে।

ক্রমশঃ সেই সব পতিত জায়গা থেকেই কালো সোনার রাশ তুলতে থাকে তারা। বিভিন্ন কোম্পানী ফলাও করে ব্যবসা শুরু করেছে।

বলরামপুরের জমিদার সুকান্ত রায়চৌধুরী জমিদার বংশের ছেলে হয়ে আর পাঁচজনের মত জমিদারীর বিলাসে হারিয়ে যাননি। আইন পাস করে বর্ধমান সদর আদালতে ওকালতি শুরু করেন।

ওর বাবা ছিলেন দুঁধে জমিদার। নিশিকান্তবাবু ছেলেকে ওকালতি ব্যবসা করতে দেখে বলেন,

—কালো কোট পরে বাঁধা বটতলায় মক্কেল ধরার চেষ্টা না করে সেরেস্তায় এসে প্রজা ঠ্যাঙ্গাও। এর চেয়ে বেশী রোজকার হবে, মান খাতিরও পাবে। আমাদের বংশে এসব কাজ কেউ করে নি সুকান্ত।

সুকান্তবাবুর পশার সবে জমছে। পয়সার চাহিদা তত নেই, বুদ্ধিমান সুদর্শন এই তরুণটি এর মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তার তীক্ষ্ণধার তর্ক, আইনের ব্যাখ্যা, আর বাচনভঙ্গী দিয়ে আদালতে নাম কিনছে।

সুকান্ত বলে—এই বেশ আছি বাবা। আর প্রজা ঠ্যাঙ্গানোর দিনও চিরকাল থাকবে না। দিন বদলাবেই। তাই এখন থেকেই তার জন্য তৈরী হচ্ছি।

ছেলেদেরও সদরে রেখে পড়াচ্ছে।

সেদিন নিশিকান্তবাবু ছেলের কথায় খুশি হন নি।

তবু সুকান্তবাবু বাবার অমতেই সদরে প্রাকটিশ্ করে নিজেও প্রভূত রোজগার করেছিলেন।

এই সময় মিঃ কুক্ তাঁর কোলিয়ারী বিক্রি করে দেশে ফিরে যেতে চান। তখন তরুণ মিঃ কুক্ নিজের পরিশ্রমে এই বনঘেরা ঠাঁইএ কোলিয়ারীর পত্তন করেছিলেন। নিজের জন্য সুন্দর

বাগান-ঘেরা বিরাট বাংলোও তৈরী করেছিলেন, স্ত্রীও সহযোগিতা করেছিল। মিসেস কুক্‌ও ঘোড়ায় চড়ে কোলিয়ারীর কাজ তদারক করতেন।

তখন কয়লা তোলা খুব কঠিন হয়ে ওঠেনি।

এখানের মাটির অনেক উপরের স্তরেই ছিল এক নম্বর কয়লার স্তর। বনজঙ্গল কেটে সাফ্ করে মাটি আট দশ ফিট সরালেই কয়লা মিলতো।

সাধারণ পুকুর কাটার পদ্ধতিতেই মাটি তোলার মত কেটে ঝুড়িতে কয়লা তোলা হয়। একে বলে পুকুরিয়া খাদ। কেটে কেটে বিস্তীর্ণ এলাকা বিরাট দিঘির মত খাদ হয়ে যায়।

তারপরই সেই স্তর ধরে সুড়ঙ্গের মত কেটে ভিতরে চলে যায়, সেই সুড়ঙ্গ পথে তখন লাইন পেতে টবে করে কয়লা তোলা হয়।

ওই ধরনের খাদকে বলে ইনক্লাইনড খাদ।

এতে উপরের কয়লা স্তর থেকেই কয়লা তোলা যেতে পারে, কিন্তু মাটির দু তিনশো ফিট নীচের কয়লার স্তর থেকে কয়লা তোলার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। আর সেই পদ্ধতিও ব্যয় সাপেক্ষ।

মাটির বুকে বিরাট কুয়োর মত করে সোজা গর্ত করা হয়। সেই গর্তটা বরাবর গিয়ে দু'তিনশো ফিট নীচের কয়লার স্তরে গিয়ে থামে। সেই কুয়োটাকে এর পর পাথর সিমেন্ট দিয়ে শক্ত করে গাঁথা হয়। কারণ দু তিনশো ফিটের মধ্যে কোথায় নরম মাটি, পাথর, বালি, জলের স্তরও থাকে। ওই জলস্তরকে মজবুত করে প্যাক্ করে না আটকালে যে কোন মুহূর্তে সেই সব জলই ধসে পড়বে গর্তে। তাই ওসব মজবুত করে প্যাক্ করে সেই কুয়োর মধ্য দিয়ে স্টিম লিফ্‌ট চালু করে নীচে নেমে এবার সেই স্তরের কয়লা কাটা শুরু হয়।

সেই কয়লা লিফ্‌ট দিয়ে খাদের উপরে এনে তোলা হয়। একে বলে 'চান্‌ক'।

সুবিনয়ের পিতামহ সুকান্তবাবু যখন কুক্ সাহেবের কাছে কোলিয়ারীটা কেনেন তখন কুক সাহেব উপরের স্তর ধরেই ইনক্লাইনড্ পিটের কাজ চালু করেছেন।

হঠাৎ এই সময় মিসেস কুক্ মারা যান কয়েকদিনের জ্বরে। মিঃ কুকের সব উদ্যম উৎসাহও থেমে যায়। মেরীকে ওই বাংলোর বাগানে সমাধিস্থ করেছিলেন কুক্। ওই ছায়াঘন পরিবেশেই বসে থাকতো। কাজে মন নেই।

কোলিয়ারীর কাজ, চালু না থাকলেই বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। মাটির অতলে গ্যাস—জল জমে ওঠে। মালপত্রও ওঠে না ঠিক মত।

যা ওঠে কয়লা তাও চুরি হয়ে যায়।

সব দেখে শুনে কুকসাহেব এদেশের পাট তুলে দিয়ে চলে যাবার মনস্থ করে।

খবরটা পেয়ে সুকান্তবাবুই এসেছিলেন।

সেদিন ওই কালো মাটি, গভীর খাদানের বুকে কয়েকটা সুড়ঙ্গ আর জীর্ণ কয়েকটা মাটির তৈরী খড়ের ছাউনি দেওয়া কুলি ধাওড়া, আর দূরে ঝর্ণার ধারে বট অশথগাছের ছায়া-ঘেরা কুসুমপুর গ্রাম, ওদিকে কুকসাহেবের বাংলো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বাকী যা ছিল তা রুক্ষ তামাটে প্রান্তর আর কিছু বনতুলসীর আগাছা ঢাকা জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা।

সুকান্তবাবু সেদিন কি এক নেশার ঘোরেই এই জোত কুসুমপুরের কোলিয়ারীটা কিনে ফেলেছিলেন।

তাঁর বাবা নিশিকান্তবাবু খবর পেয়ে বলেন,

—ওই মরামাটি আর পলাশবন আর ক'টা গাঁ কিনে কি পাবে সুকান্ত, তার চেয়ে নীলাম ভদ্রপুরের জমিদারী কিনলে আয়পয়, হতো।

সুকান্তবাবু বাবার কথায় বললেন,

—দেখা যাক কি আসে ওর থেকে। জমিদারী যা করেছেন সেইটুকু থাকলেই যথেষ্ট।

সুবিনয় তার দাদু সুকান্তবাবুকে দেখেছিল তখন সে স্কুলে পড়ে। সুকান্তবাবুর তখন বেশ বয়স হয়েছে।

ছেলে সুনন্দকান্তই বিষয়-আশয় জমিদারী দেখছে, ওই কোলিয়ারীর কুলি মজুর নিয়ে কাজেও তার অনীহা। সে এমনিতেই আয়েসী। তাই কোলিয়ারী কোন এক অবাঙ্গালীকে কয়লা তোলার কন্ট্রাক্ট দিয়েছে। বৎসরান্তে কয়লা তোলার উপর হিসাব একটা করে কিছু রয়ালটি পায় মাত্র।

সুকান্তবাবু এতে খুশী নন।

তিনি বলেন—জমিদারীর দিন ফুরিয়ে আসবে সুনন্দ, নিজেরা ব্যবসার কথা ভাবো। কোলিয়ারী নিজেরা চালাও!

কিন্তু সুনন্দবাবু এত কষ্ট করতে রাজী নন।

বলেন—কোন ঝামেলা না করে তবু কিছু তো আসছে।

সুবিনয় দাদুর সঙ্গে দু'একবার কুসুমপুর কোলিয়ারিতে এসেছে। তখনও কুক্‌সাহেবের বাংলোটা ভালো অবস্থাতেই ছিল। সুকান্তবাবু সেটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছিলেন। বাগানে ছিল নানা ধরনের গাছ। বকুল-চাঁপা-স্থলপদ্ম—বিভিন্ন জাতের গোলাপ ফুলের গাছ দিয়ে কুক্‌সাহেব বাগানটা সাজিয়েছিল, একদিকে আম-লিচু-কাঁটাল-সফেদা প্রভৃতির গাছ।

সুবিনয়ের ভালো লাগতো জায়গাটা।

লাল মাটি, ওদিকে কয়লার খাদে টই টই গভীর জলে পলাশবনের মাথা ছাড়িয়ে দিনের শেষ সূর্য অস্ত যেতো, একটি কিশোর মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো নির্জন দিগন্তের দিকে।

কোলিয়ারীর ভোঁ বাজতো।

তীক্ষ্ণ শব্দটা শান্ত দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, কিছু মালকাটার দল খাদ থেকে উঠে ধাপড়ার দিকে যাচ্ছে। কয়লার কষে কালো চেহারা ওদের, যেন অন্য জগতের জীব। ওদের চোখের চাহনিটাও পিট্‌পিট করে।

... সুবিনয়ও শুধাতো—ওরা পাতালপুরীতে কাজ করছিল দাদু? সুকান্তবাবু ঘাড় নাড়েন।

সুবিনয় বলে—একদিন পাতালে নিয়ে যাবে দাদু? খুব ইচ্ছে করে। সুকান্ত নাতির দিকে চেয়ে থাকেন।

তার অন্য নাতিদের কেউ এমন কি তার ছেলেও কোনদিন ওই পাতাল-পুরীতে যেতে চায়নি। ওরা এলে এদিক-ওদিকে গাড়ি হাঁকিয়ে ঘোরে, আসানসোল শহরে যায়।

এখানে মন টেঁকে না তাদের। বলে—কয়লার যা কষ, সবকিছু ময়লা হয়ে যায়। আর মানুষ জন কোথায় যে কথা বলবো? সবাই তো দেখি মালকাটা। কয়লার কষ মেখে ভূত হয়ে থাকে আর সন্ধ্যার পর মদ গিলে টোর হয়ে ঘোরে।

সুকান্তবাবু আজ সুবিনয়ের কথায় তাই অবাক হন। বলেন—সেকি রে ওই কয়লার ধুলো—অন্ধকারের মধ্যে যাবি।

হাসে কিশোর সুবিনয়—কেন? ওরা তো সেখানে কাজ করছে। দেখেছি ম্যানেজারবাবুও তো নামেন। একবার নিয়ে যেতে বলো না!

... সুকান্তবাবু নাতির জেদে ওকে নীচে নিয়ে গেছলেন। কিশোর সুবিনয়ের কাছে সে এক বিচিত্র জগৎ। কালো কয়লার সুড়ঙ্গ, তার মধ্যে জোরালো টর্চের আলোর আভাটুকুও যেন হারিয়ে যায়, সুড়ঙ্গগুলো যেন গোলক-ধাঁধার মত।

উপরের থেকে বিন্দু বিন্দু জলকণা পড়ছে, বাতাসে ভিজে ভিজে ভাব। তার মধ্যে গাঁইতি চালিয়ে ওরা জমাট কয়লার স্তর কাটছে, ঘামছে ওরা। ওদের কালো দেহে ঘামটা আলো পড়ে চকচক্ করে।

টব ভর্তি কয়লা টেনে নিয়ে চলেছে হলেজ রোপ বেঁধে! সুবিনয় দেখছে এই পাতালপুরীর রহস্য অন্ধকারময় জগতটাকে।

তার কিশোর মনে কি সাড়া আনে।

কতক্ষণ ওই পাতালপুরীতে ছিল আন্দাজ করতে পারে না সুবিনয়। দিনক্ষণের হিসাব এখানে থাকে না। সূর্যের আলোও এখানে অনাগত।

ওরা উঠে এল তখন বৈকাল নামছে।

পাখীরা আকাশে কলরব করে বট অশত্থগাছে এসে আশ্রয় নিচ্ছে।

সুবিনয়ের মনে তখনও পাতালপুরীর স্বপ্নটা রয়ে গেছে। সুকান্তবাবু শুধোন—কেমন লাগলো রে?

সুবিনয় বলে—সত্যিই বিচিত্র জগৎ দাদু। এতলোক কাজ করে, এত কয়লা কাটা হয়?

—হ্যাঁ!

সুবিনয় দেখছে ওদিকের রেলওয়ে সাইডিং-এ কয়েকটা মালগাড়িতে কুলি-কামিনরা কয়লা বোঝাই করছে। এই কয়লা চলে যাবে কোন্ দূরদূরান্তরে। কারখানা চালাবে—রেলইঞ্জিন চলবে।

সুবিনয় বলে—এসব তোমার, না দাদু? এই কোলিয়ারী, ওই সব কয়লা।

হাসেন সুকান্তবাবু—আমারই, তবে তুই যদি চালাতে পারিস এসবই তোর হবে। পারবি!

ওই পাতালপুরী, এই পলাশবন—এখানের পরিবেশ সুবিনয়ের ভালো লেগেছে। সে দেখেছে মাটির অতলের জগতের কিছুটা। বলে সে—এখানেই থাকবো দাদু। ওমনি মাটির নীচে নামবো।

হাসেন সুকান্তবাবু—মালকাটা হবি নাকি রে?

—তবে! সুবিনয় চাইল।

সুকান্তবাবু বলেন—তুই হবি এদের কত্তা। এখানের কত্তা। তাই আরো ভালো করে পড়তে হবে। মাটির নীচের কাজের জন্য মাইনিং পড়তে হবে।

সুবিনয়ের কিশোর মনে নোতুন সাড়া জাগে। বলে সে—তাই পড়বো দাদু।

সুকান্তবাবুও এই চেয়েছিলেন। তিনি পারেন নি, তবু জানতেন জমিদারীর আয়েসের দিন শেষ হয়ে আসবে। সেদিন এই বিলাসে লালিত মানুষগুলোর দিনও ফুরিয়ে যাবে।

তাই চেয়েছিলেন তার কোলিয়ারী আরও বড় হোক। সুবিনয়কে তাই বি-এস্‌সি পাস করার পরই মাইনিং কলেজে ভর্তি করিয়েছিলেন।